

ଏକଜନ ଜାମାତୀ
ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଇସଲାମ ଓ
ପର୍ଦା

ମୂଳ: ଥାଓଲା ଲାକାଓ

ଅନୁବାଦ ଓ ସମ୍ପାଦନା: ଡ.

ଅନୁବାଦ ଆବୁଲ୍ଲାହ ଜାହାଙ୍ଗୀର

ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ জালালা জালালুহুর জন্য। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ), তাঁর সঙ্গীগণ ও পরিজনের উপর অসংখ্য দরুদ ও সালাম।

বোন “খাওলা” একজন জাপানী নাগরিক। ফরাসী সাহিত্যে উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য তিনি ফ্রান্সে গমন করেন। ফ্রান্সে অবস্থানকালে ১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ১৯৯৩ সালের দিকে রিয়াদস্থ জাপানী দূতাবাসে কর্মরত তাঁর স্বামীর সাথে রিয়াদে আগমন করেন। ২৫/১০/১৯৯৩ তারিখে তিনি সৌদি আরবে আল-কাসিম প্রদেশের কেন্দ্র “বুরাইদা” শহরের ইসলামী কেন্দ্রের মহিলা বিভাগে ইসলাম ও পর্দা সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ইংরেজি ভাষায় একটি লিখিত প্রবন্ধ পড়ে শোনান এবং উপস্থিত বোনেদের সাথে আলোচনা ও মত বিনিময় করেন। সৌদি চিকিৎসক ডা. সালেহ আল-সালেহ মূল ইংরেজি প্রবন্ধটি (A VIEW THROUGH HIJAB)-নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন।

এ সময়ে আমি [খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর] রিয়াদে ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণারত। প্রবন্ধটি ভাল লাগে এবং আমি তা বাংলায় অনুবাদ করি। উত্তর রিয়াদ দাওয়া সেন্টার প্রবন্ধটি পর্দা বিষয়ক একটি পুস্তিকার সাথে প্রকাশ করে। দেশে ফেরার পরে ২০০০ সালে “ইসলামে পর্দা” নামক পুস্তিকার সাথে অনূদিত প্রবন্ধটি প্রকাশ করি। ২০০৭ সালে “কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা” বইটি প্রকাশের পর “ইসলামে পর্দা” পুস্তিকাটি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন থাকে না। এজন্য এ প্রবন্ধটি পৃথক পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হলো।

পাঠক ইন্টারনেটে [“A View Through Hijab”](#) লিখে সার্চ করলে এ মূল পুস্তিকাটি ও লেখিকা সম্পর্কে আরো জানতে পারবেন। ছাত্র জীবনের অনুবাদটির মধ্যে ভুলত্রান্তি থাকতে পারে। কিন্তু সংশোধন বা মূলের সাথে মিলিয়ে দেখার কোনো সময় পেলাম না।

আশা করি পুস্তিকাটি পাঠকদের ইসলামের ও পর্দার সর্বজনীনতা বুঝতে সাহায্য করবে। মহান আল্লাহর দরবারে দুআ করি, তিনি দয়া করে পুস্তিকাটির অনুবাদে ও প্রকাশে আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করে একে আমাদের ও পাঠকদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন।

আমীন!

অনুবাদের কথা

ইসলামে পর্দা ও কয়েকটি মূলনীতি এ পুস্তিকায় পর্দা বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এজন্য শুরুতে সামান্য কয়েকটি মূলনীতি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি।

পর্দা বলতে কী বোঝায় এবং পর্দার গুরুত্ব কী তা অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। পর্দা বলতে অনেকে অবরোধ বোঝেন। তারা ভাবেন যে, পর্দা করার অর্থ হলো, মুসলিম মহিলা নিজেকে গৃহের মধ্যে আটকে রাখবেন, কোন প্রয়োজনে তিনি বাইরে বেরোতে পারবেন না, পরিবারের বা সমাজের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেন যে, পর্দা নিজের কাছে বা নিজের মনে, পর্দার জন্য বিশেষ কোন বিধান বা বিশেষ কোন পোশাক নেই। এ বিষয়ে আলেম বা প্রচারকদের মতামতকে তাঁরা ধর্মান্ধতা বা বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন। কেউ বা মনে করেন যে, পর্দা করা ভাল, তবে বেপর্দা চলাফেরা কোন পাপ বা অপরাধ নয় বা কঠিক কোন অপরাধ নয়।

এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর শিক্ষার দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, পর্দা ইসলামে ব্যপক অর্থ বহন করে। পবিত্র সামাজিক পরিবেশে স্নেহ-মমতা-ভালবাসাপূর্ণ পরিবার গঠনে ইসলামের বিভিন্ন বিধানের সমষ্টিকেই এককথায় “পর্দা-ব্যবস্থা” বলা হয়। এর বিভিন্ন দিক রয়েছে, যেমন:

১) অশ্লীলতার প্রসার ঘটতে পারে এরূপ সকল কথা বা কর্ম থেকে বিরত থাকা।

২) অশ্লীলতার প্রচার বা প্রসার মূলক কাজে লিগুদেকে শাস্তি প্রদান।

৩) সন্তানদেরকে পবিত্রতা ও সততার উপর প্রতিপালন করা এবং অশ্লীলতার প্ররোচক বা অহেতুক সুড়সুড়ি মূলক সকল কর্ম, কথা বা দৃশ্য থেকে তাদেরকে দূরে রাখা।

৪) কারো আবাসগৃহে বা বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ

৫) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা নিয়ন্ত্রণ করা।

৬) সঠিক সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়েদেরকে বিবাহ দেওয়া।

৭) দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৮) নারী ও পুরুষের শালীনতাপূর্ণ পোশাক পরিধান করা।

পোশাকের বিষয়টি, বিশেষত মহিলাদের পোশাকই আমাদের সমাজে “পর্দা” বলে পরিচিত। মহিলাদের পোশাকের ক্ষেত্রে ইসলামের অন্যতম মূলনীতি:

ক. সতর আবৃত করা। কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট নির্দেশনা অনুসারে মাহরাম আত্মীয় ছাড়া অন্য সকল আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের সামনে ও ঘরের বাইরে যেতে মুসলিম মহিলার জন্য সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করা ফরয। শুধু অলঙ্কার ও মেক-আপ-মুক্ত মুখমণ্ডল ও কজি পর্যন্ত হাত খোলার অনুমতি কোনো কোনো ফকীহ প্রদান করেছেন।

খ. পোশাক ঢিলেঢালা ও স্বাভাবিক কাপড়ের হতে হবে।

গ. অমুসলিম বা পাপীগণের অনুকরণ নিষিদ্ধ।

ঘ. মহিলাদের জন্য পুরুষালি পোশাক ও পুরুষদের জন্য মেয়েলি পোশাক নিষিদ্ধ।

কুরআন মাজীদে সূরা নূর-এ পর্দা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া পর্দা বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনার জন্য পাঠককে আমার লেখা “কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা” বইটি পড়তে অনুরোধ করছি।

আমার ইসলাম

ফ্রান্সে অবস্থানকালে আমি ইসলাম গ্রহণ করি। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অধিকাংশ জাপানীর ন্যায় আমিও কোন ধর্মের অনুসারী ছিলাম না। ফ্রান্সে আমি ফরাসী সাহিত্যের উপরে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর লেখাপড়ার জন্য এসেছিলাম। আমার প্রিয় লেখক ও চিন্তাবিদ ছিলেন সাঁর্তে, নিংশে ও কামাস। এদের সবার চিন্তাধারাই নাস্তিকতাভিত্তিক।

ধর্মহীন ও নাস্তিকতা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ ছিল। আমার অভ্যন্তরীণ কোন প্রয়োজন নয়, শুধুমাত্র জানার আগ্রহই আমাকে ধর্ম সম্পর্কে উৎসাহী করে তোলে। মৃত্যুর পরে আমার কি হবে তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যাথা ছিল না, বরং কিভাবে জীবন কাটাব এটাই ছিল আমার আগ্রহের বিষয়।

দীর্ঘদিন ধরে আমার মনে হচ্ছিল আমি আমার সময় নষ্ট করে চলেছি, যা করার তা কিছুই করছি না। ঈশ্বরের বা স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকা বা না থাকা আমার কাছে সমান ছিল। আমি শুধু সত্যকে জানতে চাইছিলাম। যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব থাকে তাহলে তাঁর সাথে জীবন যাপন করব, আর যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব খুঁজে না পাই তাহলে নাস্তিকতার জীবন বেছে নেব এটাই আমার উদ্দেশ্য।

ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্ম সম্পর্কে আমি পড়াশুনা করতে থাকি। ইসলাম ধর্মকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনি। আমি কখনো চিন্তা করিনি যে এটা পড়াশোনার যোগ্য কোন ধর্ম। আমার বন্ধমূল ধারণা ছিল যে, ইসলাম ধর্ম হল মুর্খ ও সাধারণ মানুষদের একধরনের মূর্তিপূজার ধর্ম। কত অজ্ঞানই না আমি ছিলাম!

আমি কিছু খৃষ্টানের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করি। তাদের সাথে আমি বাইবেল অধ্যয়ন করতাম। বেশ কিছুদিন গত হবার পর আমি স্রষ্টার অস্তিত্বের বাস্তবতা বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি এক নতুন সমস্যার মধ্যে পড়লাম, আমি কিছুতেই আমার অন্তরে স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুভব করতে

পারছিলাম না, যদিও আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, স্রষ্টার অস্তিত্ব রয়েছে। আমি গির্জায় গিয়ে প্রার্থনা করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা, আমি স্রষ্টার অনুপস্থিতিই অনুভব করতে লাগলাম।

তখন আমি বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়ন করতে শুরু করলাম। আশা করছিলাম এ ধর্মের অনুশাসন পালনের এবং যোগাভ্যাসের মাধ্যমে আমি ঈশ্বরকে অনুভব করতে পারব। খৃষ্টান ধর্মের ন্যায় বৌদ্ধ ধর্মেও আমি অনেক কিছু পেলাম যা সত্য ও সঠিক বলে মনে হল। কিন্তু অনেক বিষয় আমি বুঝতে বা গ্রহণ করতে পারলাম না। আমার ধারণা ছিল, ঈশ্বর বা স্রষ্টা যদি থাকেন তাহলে তিনি হবেন সকল মানুষের জন্য এবং সত্য ধর্ম অবশ্যই সবার জন্য সহজ ও বোধগম্য হবে। আমি বুঝতে পারলাম না, ঈশ্বরকে পেতে হলে কেন মানুষকে স্বাভাবিক জীবন পরিত্যাগ করতে হবে।

আমি এক অসহায় অবস্থায় নিপতিত হলাম। ঈশ্বরের সন্ধানে আমার সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা কোন সমাধানে আসতে পারলো না। এমতাবস্থায় আমি একজন আলজেরীয় মুসলিম মহিলার সাথে পরিচিত হলাম। তিনি ফ্রান্সেই জন্মেছেন, সেখানেই বড় হয়েছেন। তিনি নামাজ পড়তেও জানতেন না। তার জীবনযাত্রা ছিল একজন সত্যিকার মুসলিমের জীবনযাত্রা থেকে অনেক দূরে। কিন্তু আল্লাহর প্রতি তার বিশ্বাস ছিল খুবই দৃঢ়। তার জ্ঞানহীন বিশ্বাস আমাকে বিরক্ত ও উত্তেজিত করে তোলো। আমি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অধ্যয়ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

শুরুতেই আমি পবিত্র কুরআনের এক কপি ফরাসী অনুবাদ কিনে আনি। কিন্তু আমি ২ পৃষ্ঠাও পড়তে পারলাম না, কারণ আমার কাছে তা খুবই অদ্ভুত মনে হচ্ছিল।

আমি একা একা ইসলাম বোঝার চেষ্টা ছেড়ে দিলাম এবং প্যারিস মসজিদে গেলাম, আশা করছিলাম সেখানে কাউকে পাব যিনি আমাকে সাহায্য করবেন।

সেদিন ছিল রবিবার এবং মসজিদে মহিলাদের একটি আলোচনা চলছিল। উপস্থিত বোনেরা আমাকে আন্তরিকতার সাথে স্বাগত জানালেন। আমার জীবনে এ প্রথম আমি ধর্মপালকারী মুসলিমদের সাথে পরিচিত হলাম। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম যে, নিজেকে তাঁদের মধ্যে

অনেক সহজ ও আপন বলে অনুভব করতে লাগলাম, অথচ খৃষ্টান বান্ধবীদের মধ্যে সর্বদায় নিজেকে আগন্তুক ও দূরাগত বলে অনুভব করতাম।

প্রত্যেক রবিবারে আমি আলোচনায় উপস্থিত হতে লাগলাম, সাথে সাথে মুসলিম বোনেদের দেওয়া বইপত্র পড়তে লাগলাম। এসকল আলোচনার প্রতিটি মুহূর্ত এবং বইয়ের প্রতি পৃষ্ঠা আমার কাছে ঈশ্বরের প্রত্যাদেশের মত মনে হতে লাগল। আমার মনে হচ্ছিল, আমি সত্যের সন্ধান পেয়েছি। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেজদায় রত অবস্থায় আমি স্রষ্টাকে আমার অত্যন্ত কাছে অনুভব করতাম।

আমার পর্দা

দু'বছর আগে (১৯৯১ সালের জানুয়ারী মাসে) যখন ফ্রান্সে আমি ইসলাম গ্রহণ করি তখন মুসলিম স্কুলছাত্রীদের ওড়না বা স্কার্ফ দিয়ে মাথা ঢাকা নিয়ে ফরাসীদের বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে। অধিকাংশ ফরাসী নাগরিকের ধারণা ছিল, ছাত্রীদের মাথা ঢাকার অনুমতি দান সরকারী স্কুলগুলোকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখার নীতির বিরোধী। আমি তখনো ইসলাম গ্রহণ করিনি। তবে আমার বুঝতে খুব কষ্ট হত, মুসলিম ছাত্রীদের মাথায় ওড়না বা স্কার্ফ রাখার মত সামান্য একটি বিষয় নিয়ে ফরাসীরা এত অস্থির কেন। দৃশ্যত মনে হচ্ছিল যে, ফ্রান্সের জনগণ তাদের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, বৃহৎ শহরগুলোতে নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি আরব দেশগুলো থেকে আসা বহিরাগতদের ব্যাপারে উত্তেজিত ও স্নায়ুপীড়িত হয়ে পড়েছিলেন, ফলে তারা তাদের শহরগুলোতে ও স্কুলগুলোতে ইসলামী পোশাক দেখতে আগ্রহী ছিলেন না।

অপরদিকে আরব ও মুসলিম দেশগুলোতে মেয়েদের মধ্যে, বিশেষ করে যুবতীদের মধ্যে ইসলামী হিজাব বা পর্দার দিকে ফিরে আসার জোয়ার এসেছে। অনেক আরব বা মুসলিম, এবং অধিকাংশ পাশ্চাত্য জনগণের কাছে এটা ছিল কল্পনাভিত্তিক; কারণ তাদের ধারণা ছিল যে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসারের সাথে পর্দা প্রথার বিলুপ্তি ঘটবে।

ইসলামী পোশাক ও পর্দা ব্যবহারের আগ্রহ ইসলামী পুনর্জাগরণের একটা অংশ। এর মাধ্যমে আরব ও মুসলিম জনগোষ্ঠীসমূহ তাদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট, অর্থনৈতিক ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যের মাধ্যমে যে গৌরব বিনষ্ট ও পদদলিত করার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করা হচ্ছে।

জাপানী জনগণের দৃষ্টিতে মুসলমানদের পুরোপুরি ইসলাম পালন একধরনের পাশ্চাত্য বিরোধিতা ও প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরে রাখার মানসিকতা, যা মেজি যুগে জাপানীদের মধ্যে বিদ্যমান

ছিল। তখন তারা প্রথম পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে এবং পাশ্চাত্য জীবনযাত্রা ও পোশাক পরিচ্ছদের বিরোধিতা করে।

মানুষ সাধারণত ভালমন্দ বিবেচনা না করেই যে কোন নতুন বা অপরিচিত বিষয়ের বিরোধিতা করে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন যে, হিজাব বা পর্দা হচ্ছে মেয়েদের নিপীড়নের একটি প্রতীক। তারা মনে করেন, যে সকল মহিলা পর্দা মেনে চলে বা চলতে আগ্রহী তারা মূলত প্রচলিত প্রথার দাসত্ব করেন। তাদের বিশ্বাস, এ সকল মহিলাদেরকে যদি তাদের ন্যাঙ্কারজনক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন করা যায় এবং তাদের মধ্যে নারীমুক্তি আন্দোলন ও স্বাধীন চিন্তার আহ্বান সঞ্চারিত করা যায় তাহলে তারা পর্দাপ্রথা পরিত্যাগ করবে।

এধরণের উদ্ভট বাজে চিন্তা শুধু তারাই করেন যাদের ইসলাম সম্পর্কে ধারণা খুবই সীমাবদ্ধ। ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মবিরোধী চিন্তাধারা তাদের মনমগজ এমনভাবে অধিকার করে নিয়েছে যে তারা ইসলামের সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতা বুঝতে একেবারেই অক্ষম। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশ্বের সর্বত্র অগণিত অমুসলিম মহিলা ইসলাম গ্রহণ করছেন, যাদের মধ্যে আমিও রয়েছি। এদ্বারা আমরা ইসলামের সর্বজনীনতা বুঝতে পারি।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইসলামী হিজাব বা পর্দা অমুসলিমদের জন্য একটি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার। পর্দা শুধু নারীর মাথার চুলই ঢেকে রাখে না, উপরন্তু আরো এমন কিছু আবৃত করে রাখে যেখানে তাদের কোন প্রবেশাধিকার নেই। আর এজন্যই তারা খুব অস্বস্তি বোধ করেন। বস্ত্র পর্দার অভ্যন্তরে কী আছে বাইরে থেকে তারা তা মোটেও জানতে পারেন না।

প্যারিসে অবস্থানকালেই ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি হিজাব বা পর্দা মেনে চলতাম। আমি একটা স্কার্ফ দিয়ে আমার মাথা ঢেকে নিতাম। পোশাকের সংগে মিলিয়ে একই রঙের স্কার্ফ ব্যবহার করতাম। হয়ত অনেকে এটাকে নতুন একটা ফ্যাশন ভাবত। বর্তমানে সৌদি আরবে অবস্থানকালে আমি কাল বোরকায় আমার সমস্ত দেহ আবৃত করে রাখি, এমনকি আমার মুখমণ্ডল এবং চোখও।

যখন ইসলাম গ্রহণ করি তখন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে পারব কিনা, অথবা পর্দা করতে পারব কিনা তা নিয়ে আমি গভীরভাবে ভেবে দেখিনি। আসলে আমি নিজেকে এ নিয়ে প্রশ্ন করতে চাইনি; কারণ আমার ভয় হত, হয়ত উত্তর হবে না সূচক এবং তাতে আমার ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত বিঘ্নিত হবে। প্যারিসের মসজিদে যাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আমি এমন এক জগতে বাস করেছি যার সাথে ইসলামের সামান্যতম সম্পর্ক ছিল না। নামাজ, পর্দা কিছুই আমি চিনতাম না। আমার জন্য একথা কল্পনা করাও কষ্টকর ছিল যে, আমি নামাজ আদায় করছি বা পর্দা পালন করে চলছি। তবে ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা আমার এত গভীর ও প্রবল ছিল যে ইসলাম গ্রহণের পরে আমার কি হবে তা নিয়ে আমি ভাবিনি। বস্তুতঃ আমার ইসলাম গ্রহণ ছিল আল্লাহর অলৌকিক দান। আল্লাহ আকবার!

ইসলামী পোশাক বা হিজাবে আমি নিজেকে নতুন ব্যক্তিত্বে অনুভব করলাম। আমি অনুভব করলাম যে আমি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়েছি, আমি সংরক্ষিত হয়েছি। আমি অনুভব করতে লাগলাম আল্লাহ আমার সঙ্গে রয়েছেন।

একজন বিদেশিনী হিসাবে অনেক সময় আমি লোকের দৃষ্টির সামনে বিব্রত বোধ করতাম। হিজাব ব্যবহার এ অবস্থা কেটে গেল। পর্দা আমাকে এ ধরনের অভদ্র দৃষ্টি থেকে রক্ষা করল।

পর্দার মধ্যে আমি আনন্দ ও গৌরব বোধ করতে লাগলাম, কারণ পর্দা শুধু আল্লাহর প্রতি আমার আনুগত্যের প্রতীকই নয়, উপরন্তু তা মুসলিম নারীদের মাঝে আন্তরিকতায় বাঁধন। পর্দার মাধ্যমে আমরা ইসলাম পালনকারী মহিলারা একে অপরকে চিনতে পারি এবং আন্তরিকতা অনুভব করি। সর্বোপরি, পর্দা আমার চারপাশের সবাইকে মনে করিয়ে দেয় আল্লাহর কথা, আর আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে আল্লাহ আমার সাথে রয়েছেন। পর্দা আমাকে বলে দেয়: “সতর্ক হও! একজন মুসলিম নারীর যোগ্য কর্ম কর।”

একজন পুলিশ যেমন ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে অধিক সচেতন থাকেন, তেমনি পর্দার মধ্যে আমি একজন মুসলিম হিসেবে নিজেকে বেশি করে অনুভব করতে

লাগলাম। আমি যখনই মসজিদে যেতাম তখনই হিজাব ব্যবহার করতাম। এটা ছিল আমার সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক ব্যাপার, কেউই আমাকে পর্দা করতে চাপ দেয়নি।

ইসলাম গ্রহণের দুই সপ্তাহ পরে আমি আমার এক বোনের বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য জাপানে যাই। সেখানে যাওয়ার পর আমি সিদ্ধান্ত নিই, ফ্রান্সে আর ফিরে যাব না। কারণ ইসলাম গ্রহণের পর ফরাসী সাহিত্যের প্রতি আমি আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। উপরন্তু আরবী ভাষা শেখার প্রতি আমি আগ্রহ অনুভব করতে লাগলাম।

মুসলিম পরিবেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে একাকী জাপানের একটি ছোট্ট শহরে বসবাস করা আমার জন্য একটা বড় ধরনের পরীক্ষা ছিল। তবে এ একাকিত্ব আমার মধ্যে মুসলমানিত্বের অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর করে তোলে।

ইসলামের দৃষ্টিতে মহিলাদের জন্য শরীর দেখানো পোশাক পরা নিষিদ্ধ, কাজেই আমার আগের মিনি-স্কার্ট, হাফহাতা ব্লাউজ ইত্যাদি অনেক পোশাকই আমাকে পরিত্যাগ করতে হল। এছাড়া পাশ্চাত্য ফ্যাশন ইসলামী হিজাব বা পর্দার পরিপন্থী, এজন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে নিজের পোশাক নিজেই তৈরি করে নেব। আমার এক পোশাক তৈরিতে অভিজ্ঞ বান্ধবীর সহযোগীতায় আমি দু সপ্তাহের মধ্যে আমার জন্য পোশাক তৈরি করে ফেললাম। পোশাকটি ছিল অনেকটা পাকিস্তানী সেলোয়ার-কামিজের মত। আমার এই অদ্ভুত পোশাক দেখে কে কি ভাবল তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি।

জাপানে ফেরার পর ছ'মাস এভাবে কেটে গেল। কোন মুসলিম দেশে গিয়ে আরবী ভাষা ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে পড়াশোনা করার আগ্রহ আমার মধ্যে খুবই প্রবল হয়ে উঠল। এ আগ্রহ বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হলাম। অবশেষে মিশরের রাজধানী কাইরোতে পাড়ি জমালাম।

কাইরোতে মাত্র একব্যক্তিকেই আমি চিনতাম। আমার এই মেজবানের পরিবারের কেউই ইংরেজি জানত না। আমি একেবারেই পাথারে পড়লাম। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল, যে মহিলা আমাকে হাত ধরে বাসার ভিতরে নিয়ে গেলেন তিনি কাল কাপড়ে (বোরকায়) তাঁর মুখমণ্ডল ও

হাত সহ মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর ঢেকে রেখেছিলেন। এ ফ্যাশন (বোরকা) এখন আমার অতি পরিচিত এবং বর্তমানে রিয়াদে অবস্থানকালে আমি নিজেও এই পোশাক ব্যবহার করি। কিন্তু কায়রোতে পৌঁছেই এটা দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হই।

ফ্রান্সে থাকতে একদিন আমি মুসলমানদের একটা বড় ধরনের কনফারেন্সে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং সেখানেই আমি সর্বপ্রথম এ ধরনের মুখঢাকা কালো পোশাক দেখতে পাই। রং বেরঙের স্কার্ফ ও পোশাক পরা মেয়েদের মাঝে তাঁর পোশাক খুবই বেমানান লাগছিল। আমি ভাবছিলাম, এ মহিলা মূলত আরব ট্রেডিশন ও আচরণের অন্ধ অনুকরণের ফলেই এ রকম পোশাক পরেছেন, ইসলামের সঠিক শিক্ষা তিনি জানতে পারেননি। ইসলাম সম্পর্কে তখনো আমি বিশেষ কিছু জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, মুখ ঢেকে রাখা একটা আরবীয় অভ্যাস ও আচরণ, ইসলামের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কাইরোর ঐ মহিলাকে দেখেও আমার অনেকটা অনুরূপ চিন্তাই মনে এসেছিল। আমার মনে হয়েছিল, পুরুষদের সাথে সকল প্রকার সংযোগ এড়িয়ে চলার যে প্রবণতা এই মহিলার মধ্যে রয়েছে তা অস্বাভাবিক।

কালো পোশাক পরা বোন আমাকে জানালেন যে, আমার নিজে তৈরি পোশাক বাইরে বেরোনোর উপযোগী নয়। আমি তার কথা মেনে নিতে পারিনি। কারণ আমার বিশ্বাস ছিল, একজন মুসলিম মহিলার পোশাকের যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার তা সবই আমার ঐ পোশাকে ছিল।

তবুও আমি ঐ মিশরীয় বোনের মত ম্যাক্সি ধরনের কাল রঙের বড় একটা কাপড় কিনালাম (যা গলা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে) উপরন্তু একটি কাল খিমার অর্থাৎ বড় ধরনের শরীর জড়ানো চাদরের মত ওড়না কিনালাম যা দিয়ে আমার শরীরের উপরিভাগ, মাথা ও দুবাহু আবৃত করে নিতাম। আমি আমার মুখ ঢাকতেও রাজী ছিলাম, কারণ দেখলাম তাতে বাইরের রাস্তার ধুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু আমার বোনটি জানালেন, মুখ ঢাকার কোন প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র ধুলো থেকে বাঁচার জন্য মুখ ঢাকা নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিজে মুখ ঢেকে রাখতেন, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তা ঢেকে রাখা আবশ্যিক।

মুখ ঢেকে রাখা যে সকল বোনের সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল কাইরোতে তাঁদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। কাইরোর অনেক মানুষ কাল খিমার বা ওড়না¹ দেখলেই বিরক্ত বা বিব্রত হয়ে উঠতেন। পাশ্চাত্য ধাঁচে জীবনযাপনকারী সাধারণ মিশরীয় যুবকেরা এ সকল খিমারে ঢাকা পর্দানশীন মেয়েদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। এদেরকে তাঁরা “ভগ্নীগণ” বলে সম্বোধন করতেন। রাস্তাঘাটে বা বাসে উঠলে সাধারণ মানুষেরা এদেরকে বিশেষ সম্মান করতেন ও ভদ্রতা দেখাতেন। এসকল মহিলা রাস্তাঘাটে একে অপরকে দেখলে আন্তরিকতার সাথে সালাম বিনিময় করতেন, তাঁদের মধ্যে কোন ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলেও।

ইসলাম গ্রহণের আগে আমি স্কার্টের চেয়ে প্যান্ট বেশি পছন্দ করতাম। কাইরো এসে লম্বা টিলেঢালা কালো পোশাক পরতে শুরু করলাম। শীঘ্রই আমি এই পোশাককে পছন্দ করে ফেললাম। এ পোশাক পরে নিজেকে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত মনে হত। মনে হত আমি একজন রাজকন্যা। তাছাড়া এ পোশাকে আমি বেশ আরাম বোধ করতাম যা প্যান্ট পরে কখনো অনুভব করিনি।

খিমার বা ওড়না পরা বোনদেরকে সত্যিই অপূর্ব সন্দর দেখাতো। তাদের চেহারায় এক ধরনের পবিত্রতা ও সাধুতা ফুটে উঠত। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক মুসলিম নারী বা পুরুষ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নির্দেশাবলী পালন করে এবং সেজন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে। আমি ঐ সকল মানুষের মানষিকতা মোটেও বুঝতে পারি না, যাঁরা ক্যাথলিক সিস্টারদের ঘোমটা দেখলে কিছুই বলেন না, অথচ মুসলিম মহিলাদের ঘোমটা বা পর্দার সমালোচনায় তাঁরা পঞ্চমুখ, কারণ এটা নাকি নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের প্রতীক!

আমার মিশরীয় বোন আমাকে বলেন, আমি যেন জাপানে ফিরে গিয়েও এ পোশাক ব্যবহার করি। এতে আমি অসম্মতি জানাই। আমার ধারণা ছিল, আমি যদি এ ধরনের পোশাক

¹ মিশরের পর্দানশীন মহিলাদের কেউ কেউ নিকাব ব্যবহার করেন, অর্থাৎ মুখ ঢেকে রাখেন। অন্যান্যরা শুধু খিমার বা শরীর জড়ানো বড় ওড়না ব্যবহার করেন, অর্থাৎ মুখ খোলা রেখে বাকি সমস্ত শরীর ঢেকে রাখেন। লেখিকা এখানে ও পরবর্তী আলোচনায় এ দুই শ্রেণীর পর্দানশীন মহিলাদেরকে বোঝাচ্ছেন।

পরে জাপানের রাস্তায় বেরোই তাহলে মানুষ আমাকে অভদ্র ও অস্বাভাবিক ভাবে। পোশাকের কারণে তারা আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। আমার কোন কথাই তারা শুনবে না। আমার বাইরে দেখেই তারা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করবে। ইসলামের মহান শিক্ষা ও বিধানাবলী জানতে চাইবে না।²

আমার মিশরীয় বোনকে আমি এ যুক্তিই দেখিয়েছিলাম। কিন্তু দুমাসের মধ্যে আমি আমার নতুন পোশাককে ভালবেসে ফেললাম। তখন আমি ভাবতে লাগলাম, জাপানে গিয়েও আমি এ পোশাকই পরব। এ উদ্দেশ্যে আমি জাপানে ফেরার কয়েকদিন আগে হালকা রঙের ঐ জাতীয় কিছু পোশাক এবং কিছু সাদা খিমার (বড় চাদর জাতীয় ওড়না) তৈরি করলাম। আমার ধারণা ছিল, কালোর চেয়ে এগুলো বেশি গ্রহণযোগ্য হবে সাধারণ জাপানীদের দৃষ্টিতে।

আমার সাদা খিমার বা ওড়নার ব্যাপারে জাপানীদের প্রতিক্রিয়া ছিল আমার ধারণার চেয়ে অনেক ভাল। মূলত আমি কোনরকম প্রত্যাখ্যান বা উপহাসের সম্মুখীন হইনি। মনে হচ্ছিল, জাপানীরা আমার পোশাক দেখে আমি কোন ধর্মাবলম্বী তা না বুঝলেও আমার ধর্মানুরাগ বুঝে নিচ্ছিল। একবার আমি শুনলাম, আমার পিছনে এক মেয়ে তার বান্ধবীকে আস্তে আস্তে বলছে, দেখ একজন বৌদ্ধ ধর্মযাজিকা!

² এ ধরনের চিন্তা অনেক সময় ধর্মপ্রাণ মুসলিমের মনে জাগে। আমরা ভেবে বসি, পর্দা পালন করলে, অথবা দাড়ি রাখলে, অথবা নিয়মিত জামাতে নামাজ পড়লে অনেকে আমাকে গোড়া ভাবে এবং আমার আহ্বানে ইসলামের পথে এগিয়ে আসবে না। এজন্য আমরা ধর্মের এসকল বিধানকে গুরুত্বপূর্ণ মেনেও অমান্য করতে থাকি। আমরা বুঝতে পারি না যে, এটা শয়তানের প্ররোচনা, এর মাধ্যমে শয়তান আমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। মানুষের চিরশত্রু শয়তানের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়া। যখন সে কোন মানুষকে পুরোপুরি বিভ্রান্ত করতে অক্ষম হয়, তখন সে চেষ্টা করে যতটা সম্ভব আল্লাহর বিধান পালন থেকে তাকে দূরে রাখতে। এজন্য বিভিন্ন প্ররোচনা সে মানুষের মনে এনে দেয়। সবচেয়ে বিপদজনক প্ররোচনা হল মানুষের মনে এ ভাব জাগ্রত করা যে, আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার বিধান অমান্য করছি। এতে মানুষ পাপে পতিত হয়, অথচ পুণ্য করছি বলে মনে করে। আমাদের বুঝতে হবে, আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও করুণা লাভের জন্য ধর্মপালন করি। কোন বিষয়কে ধর্মের বিধান বলে জানার পর কারো মুখ চেয়ে তা অমান্য করা অন্যায়। আল্লাহর পথে মানুষদের আহ্বান করা প্রত্যেকের দায়িত্ব, তবে সেজন্য তার নির্দেশ অমান্য করার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের সঠিক ধর্মপালনে যদি কেউ ইসলামকে না বুঝেই প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে তিনি নিজেই দায়ী হবেন। যিনি ধর্ম পালন করছেন এবং যিনি ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করছেন সবাই আল্লাহর সৃষ্টি, মৃত্যুর পরে সবাইকে তার সামনে নিজ নিজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। একজনের ভুল বা অন্যায়ের জন্য অন্য কেউ দায়ী হবেন না।

একবার ট্রেনে যেতে আমার পাশে বসলেন এক আধবয়সী ভদ্রলোক। কেন আমি এরকম অদ্ভুত ফ্যাশনের পোশাক পরেছি তা তিনি জানতে চাইলেন। আমি তাকে বললাম, আমি একজন মুসলিম। ইসলাম ধর্মে মেয়েদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা যেন তাদের দেহ ও সৌন্দর্য আবৃত করে রাখে। কারণ তাদের অনাবৃত দেহসুশমা ও সৌন্দর্য পুরুষদেরকে আকর্ষিত করে তুলতে পারে। অনেক পুরুষের জন্য এ ধরনের আকর্ষণ প্রতিরোধ করা কষ্টকর। তাই নারীদের উচিত নয় দেহ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে তাদেরকে বিরক্ত করা বা সমস্যায় ফেলা।

মনে হল আমার ব্যাখ্যায় তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন। ভদ্রলোক সম্ভবত আজকালকার মেয়েদের উত্তেজক ফ্যাশন মেনে নিতে পারছিলেন না। তাঁর নামার সময় হয়েছিল। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে নেমে গেলেন এবং বলে গেলেন তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল ইসলাম সম্পর্কে আরো কিছু জানার, কিন্তু সময়ের অভাবে পারলেন না।

গরমকালের রৌদ্রতপ্ত দিনেও আমি পুরো শরীর ঢাকা লম্বা পোশাক পরে এবং “খিমার” দিয়ে মাথা ঢেকে বাইরে যেতাম। এতে আমার আকা দুঃখ পেতেন, ভাবতেন আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আমি দেখলাম রৌদ্রের মধ্যে আমার এ পোশাক খুবই উপযোগী, কারণ এতে মাথা ঘাড় ও গলা সরাসরি রোদের তাপ থেকে রক্ষা পেত। উপরন্তু আমার বোনেরা যখন হাফপ্যান্ট পরে চলাফেরা করত, তখন ওদের সাদা উরু দেখে আমি অস্বস্তি বোধ করতাম।

অনেক মহিলা এমন পোশাক পরেন যাতে তাদের বুক ও নিতম্বের আকৃতি পরিস্কার ফুটে উঠে। ইসলাম গ্রহণের আগেও আমি এ ধরনের পোশাক দেখলে অস্বস্তি বোধ করতাম। আমার মনে হত এমন কিছু অঙ্গ প্রদর্শন করা হচ্ছে যা ঢেকে রাখা উচিত, বের করা উচিত নয়। একজন মেয়ের মনে যদি এসকল পোশাক এ ধরনের অস্বস্তিবোধ এনে দেয় তাহলে একজন পুরুষ এ পোশাক পরা মেয়েদেরকে দেখলে কিভাবে প্রভাবিত হবেন তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আপনারা হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন, শরীরের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক আকৃতি ঢেকে রাখার কি দরকার? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে আসুন একটু ভেবে দেখি। আজ থেকে ৫০ বৎসর

আগে জাপানে মেয়েদের জন্য সুইমিং স্যুট পরে সুইমিং পুলে সাঁতার কাটা অশ্লীলতা ও অন্যায্য বলে মনে করা হত। অথচ আজকাল আমরা বিকিনি পরে সাঁতার কাটতে কোন লজ্জাবোধ করি না। তবে যদি কোন মহিলা জাপানের কোথাও টপলেস ও প্যান্ট পরে শরীরের উর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত করে সাঁতার কাটেন তাহলে লোকে তাঁকে নির্লজ্জ বলে।

আবার দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্র সৈকতে যান, দেখতে পাবেন সেখানে সকল বয়সের অসংখ্য নারী শরীরের উর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ অনাবৃত করে টপলেস পরে সানবাথ বা রৌদ্রস্নান করছেন। আরেকটু এগিয়ে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে যান, সেখানে অনেক সৈকতে নুডিস্ট বা নগ্নবাদীদেরকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে রৌদ্রস্নানে রত দেখতে পাবেন।

যদি একটু পিছনে তাকান তাহলে দেখতে পাবেন মধ্যযুগের একজন বৃটিশ নাইট তাঁর প্রিয়তমার জুতার দৃশ্যতে প্রকম্পিত হয়ে উঠতেন। এথেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, নারীদেহের গোপন অংশ, বা ঢেকে রাখার মত অংশ কী সে ব্যাপারে আমাদের মানসিকতা পরিবর্তনশীল।

এখানে আমার প্রশ্ন: আপনি কি একজন নুডিস্ট বা নগ্নবাদী? আপনি কি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে চলাফেরা করেন? যদি আপনি নুডিস্ট না হন তাহলে বলুন, যদি কোন নুডিস্ট আপনাকে জিজ্ঞাসা করেন: “কেন আপনি আপনার বুক ও নিতম্ব ঢেকে রাখেন, অথচ মুখ ও হাতের ন্যায় বুক ও নিতম্বও তো শরীরের স্বাভাবিক অংশ?” তাহলে আপনি কি বলবেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আপনি যা বলবেন, আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি ঠিক সেকথাই বলব। আপনি যেমন শরীরের স্বাভাবিক অংশ হওয়া সত্ত্বেও বুক ও নিতম্বকে গোপনীয় অঙ্গ বলে মনে করেন, আমরা মুসলিম নারীরা মুখমন্ডল ও হাত ছাড়া সমস্ত শরীরকে গোপনীয় অঙ্গ বলে মনে করি, কারণ মহান স্রষ্টা আল্লাহ এভাবেই আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এজন্যই আমরা নিকটাত্মীয় (মাহরাম) ছাড়া অন্যান্য পুরুষের থেকে মুখ ও হাত ছাড়া সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করে রাখি।

আপনি যদি কোনকিছু লুকিয়ে রাখেন তাহলে তার মূল্য বেড়ে যাবে। নারীর শরীর আবৃত রাখলে তার আকর্ষণ বেড়ে যায়, এমনকি অন্য নারীর চোখেও তা অধিকতর আকর্ষণীয় হয়ে উঠে। পর্দানশীন বোনেদের কাঁধ ও গলা অপূর্ব সুন্দর দেখায়, কারণ তা সাধারণত আবৃত থাকে।

যখন কোন মানুষ লজ্জার অনুভূতি হারিয়ে নগ্ন হয়ে রাস্তাঘাটে চলতে থাকেন, প্রকাশ্য জনসমক্ষে পেশাব, পায়খানা ও “প্রেম” করতে থাকেন, তখন তিনি পশুর সমান হয়ে যান, তাঁকে আর কোনভাবেই পশু থেকে পৃথক করা যায় না। আমার ধারণা, লজ্জার অনুভূতি থেকেই মানব সভ্যতার শুরু।

অনেক জাপানী মহিলা শুধু ঘর থেকে বেরোতে হলেই মেক-আপ ও সাজগোজ করেন। ঘরে তাঁদেরকে কেমন দেখাচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামান না। অথচ ইসলামের বিধান হল, একজন স্ত্রী বিশেষভাবে স্বামীর জন্য নিজেকে সুন্দরী ও আকর্ষণীয় করে রাখতে সচেষ্ট হবেন। অনুরূপভাবে একজন স্বামী তার স্ত্রী মনোরঞ্জনের জন্য নিজেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করতে সচেষ্ট হবেন। উপরন্তু লজ্জার সহজাত অনুভূতি এদের সম্পর্ক আরো আনন্দময় ও মনোরম করে তোলে।

আপনারা হয়ত বলবেন, পুরুষদেরকে উত্তেজিত না করার উদ্দেশ্যে আমাদের মুখ ও হাত ছাড়া বাকী পুরো শরীর ঢেকে রাখাটা বাড়াবাড়ি এবং অতি-সতর্কতা। একজন পুরুষ কি শুধুমাত্র যৌন আগ্রহ নিয়েই একজন নারীর দিকে তাকান? একথা ঠিক যে সব পুরুষই প্রথমেই যৌন অনুভূতি নিয়ে নারীকে দেখেন না। তবে নারীকে দেখার পর তাঁর পোশাক ও আচরণ থেকে পুরুষের মনে যে আগ্রহ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয় তা প্রতিরোধ করা তার জন্য খুবই কষ্টকর। এ ধরনের আবেগ নিয়ন্ত্রণে পুরুষেরা বিশেষভাবে দুর্বল। বর্তমান বিশ্বের অতি আলোচিত ধর্ষণ ও যৌন অত্যাচারের পরিমাণ দেখলেই আমরা একথা বুঝতে পারব।

কেবলমাত্র পুরুষদের প্রতি মানবিক আবেদন জানিয়ে এবং তাদেরকে আত্মনিয়ন্ত্রণের আহ্বান জানিয়ে আমরা ধর্ষণ ও অত্যাচারের এ সমস্যার সমাধানের আশা করতে পারি না। পর্দা ছাড়া এগুলো রোধের কোন উপায় নেই। একজন পুরুষ নারীর পরিধানের মিনি-স্কাটের অর্থ এরূপ

মনে করতে পারেন: “তুমি চাইলে আমাকে পেতে পার,” অপরদিকে ইসলামী হিজাব পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়: “আমি তোমার জন্য নিষিদ্ধ।”

কায়রো থেকে জাপানে ফিরে আমি তিন মাস ছিলাম। এরপর আমি আমার স্বামীর সাথে সৌদি আরবে আসি। শুনেছিলাম যে, সৌদি আরবে সব মেয়েকে মুখ ঢাকতে হয়, তাই আমার মুখ ঢাকার জন্য ছোট একটা কাল কাপড় বা নিকাব আমি সাথে করে এনেছিলাম। রিয়াদে পৌঁছে দেখলাম এখানের সব মহিলা মুখ ঢাকেন না। বিদেশী অমুসলিম মহিলারা শুধু দায়সারাভাবে একটা কাল গাউন পিঠের উপর ফেলে রাখেন; মুখ, মাথা কিছুই ঢাকেন না। বিদেশী মুসলিম মহিলারা অনেকেই মুখ খোলা রাখেন। সৌদি মহিলারা সবাই মুখ সহ আপদমস্তক দেহ আবৃত করে চলাফেরা করেন।

রিয়াদে এসে প্রথমবার বাইরে বেরোনোর সময় আমি “নিকাব” দিয়ে আমার মুখ ঢেকে নিই। বেশ ভাল লাগল। আসলে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এতে কোন অসুবিধা বোধ হয় না। বরং আমার মনে হতে লাগল যে, আমি একটি বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছি। কোন মূল্যবান শিল্প চুরি করে নিয়ে গোপনে দেখে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় ঠিক তেমনি আনন্দ অনুভব করছিলাম আমি। অনুভব করলাম আমার এমন একটা মূল্যবান সম্পদ রয়েছে যা দেখার অনুমতি নেই সবার জন্য।

রিয়াদের রাস্তায় একজন মোটাসোটা পুরুষ এবং তার সাথে সর্বাঙ্গ কালো বোরকায় আবৃত একজন মহিলাকে দেখে একজন বিদেশী হয়ত ভাববেন যে, এই দম্পতির মধ্যের সম্পর্ক হচ্ছে অত্যাচার ও নিপীড়নের, মহিলাটি অত্যাচারিত এবং তাঁর স্বামীর দাসীতে পরিণত হয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বোরকা পরা এ সকল মহিলাদের অনুভূতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা নিজেদেরকে চাকর বরকন্দাজের প্রহরাধীন সম্রাজ্ঞীর মত ভাবেন।

রিয়াদের প্রথম কয়েক মাস আমি আমার নিকাব বা মুখাবরণ দিয়ে শুধু চোখের নিচের অংশটুকু ঢাকতাম, চোখ ও কপাল খোলা থাকত। শীতের পোশাক বানাতে গিয়ে আমি একটা

চোখঢাকা নিকাব বানিয়ে নিলাম। এবার আমার সাজ পুরো হল, আর আমার শান্তি ও তৃপ্তিও পূর্ণতা পেল। এখন আমি ভিড়ের মধ্যেও অস্বস্তি বোধ করি না। যখন চোখ খোলা রাখতাম তখন মাঝেমাঝে হঠাৎ করে কোন পুরুষের সাথে চোখাচোখি হলে বিব্রত হয়ে পড়তাম। কালো সানগ্লাসের মত চোখ ঢাকা নিকাবের ফলে অপরিচিত পুরুষের অনাহুত চোখাচোখি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

একজন মুসলিম মহিলা তাঁর নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেকে আবৃত করে রাখেন। অনাঙ্গীয় পুরুষের দৃষ্টির অধীনস্থ হতে তিনি রাজি নন। তিনি চান না তাদের উপভোগের সামগ্রী হতে। পাশ্চাত্যের বা পাশ্চাত্যপন্থী যে সকল মহিলা তাঁদের শরীরকে পুরুষদের সামনে উপভোগের সামগ্রী রূপে তুলে ধরেন তাঁদের প্রতি একজন মুসলিম নারী করুণা বোধ করেন।

বাইরে থেকে হিজাব বা পর্দা দেখে এর ভিতরে কি আছে তা বোঝা আদৌ সম্ভব নয়। বাইরে থেকে পর্দা ও পর্দানশীনদের পর্যবেক্ষণ করা, আর পর্দার মধ্যে জীবন কাটান দুটো সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। দুটি বিষয়ের মধ্যে যে গ্যাপ রয়েছে সেখানে নিহিত রয়েছে ইসলামকে বোঝার গ্যাপ।

বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ইসলাম একটি জেলখানা, এখানে কোন স্বাধীনতা নেই। কিন্তু আমরা, যারা এর মধ্যে অবস্থান করছি আমরা এত শান্তি, আনন্দ ও স্বাধীনতা অনুভব করছি যা ইসলাম গ্রহণের আগে কখনোই করিনি। পাশ্চাত্যের তথাকথিত স্বাধীনতা পায়ে ঠেলে আমরা ইসলামকে বেছে নিয়েছি। এ কথা যদি সত্যি হত যে, ইসলাম মেয়েদেরকে নিপীড়ন করেছে এবং তাদের অধিকার খর্ব করেছে, তাহলে ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান সহ বিভিন্ন দেশের অগণিত মেয়ে কেন তাদের সকল স্বাধীনতা ও স্বাধিকার পায়ে ঠেলে ইসলাম গ্রহণ করেছে? আমি আশা করি সবাই বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা বা ভ্রান্ত পূর্বধারণার কারণে যদি কেউ অন্ধ না হন তাহলে তিনি অবশ্যই দেখবেন একজন পর্দানশীন মহিলা কি অপূর্ব সুন্দর। তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে স্বর্গীয়

সৌন্দর্য, দেবীত্বের ও সতীত্বের আভা। আত্মনির্ভরতা ও আত্মমর্যাদায় উদ্ভাসিত তাঁর চেহারা। অত্যাচারের বা নিপীড়নের সামান্যতম কোন চিহ্নই আপনি তাঁর চেহারায় পাবেন না।

এটা জ্বলন্ত সত্য, কিন্তু তারপরও অনেকে তা দেখতে পান না। কেন? সম্ভবত তাঁরা ঐ ধরনের মানুষ যারা আল্লাহর নিদর্শন দেখেও, জেনেও অস্বীকার করেন। প্রচলিত প্রথার দাসত্ব, বিদ্বেষ, ভ্রান্তধারণা ও স্বার্থের অন্বেষণ যাদেরকে অন্ধ করে ফেলেছে। ইসলামের সত্যকে অস্বীকার করার এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে?